হেলিজ্যাপাটার আশ্চর্য প্রাণীরা (পর্ব-১)

খন্দকার জাহিদ হাসান

''**ক্যা**প্টেন, এ কোন্ চুলোতে এসে প'ড়লাম আমরা? চারিদিকে শুধু গাছপালা, বিল-ঝিল, এঁদো পুকুর, খানাখন্দ আর সোঁদা মাটি!''-খুবই চিকণ গলায় অত্যন্ত মোলায়েম সুরে মহাকাশযানের অধিনায়ক সাক্রাই ত্রিমুকে জিজ্ঞেস করল তাঁর এক মেয়ে সহযাত্রী ভূ-তাত্ত্বিক লোশাও মারু।

অধিনায়ক তার চেয়েও আরো বেশী মোলায়েম অথচ স্পষ্ট স্বরে জবাব দিলেন, ''আমাদের জি,পি,এস, যন্ত্রটি জানাচ্ছে যে, এই জায়গাটির নাম বাংলাদেশ।'' প্রায় মাছির মত পিন্‌পিনে কণ্ঠে লোশাও বল্‌ল, ''সে তো বুঝলাম। কিন্তু খেয়াল ক'রেছেন কি যে, এখানে কোথাও তিল পরিমাণ বালি নেই যে আমরা খেতে পারি! কোনো নুড়ি বা পাথরও নেই যে, ক্রাশারে গুঁড়ো ক'রে পেটে চালান দেব!''
''হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। তবে অনেকদিন আগে প্রাপ্ত আমাদের আন্তঃনাক্ষত্রিক উপাত্ত অনুসারে এখানে তো কিছু বালি থাকার কথা।'' ভ্রমরের মত গুণ্‌গুণিয়ে মন্তব্য করলেন অধিনায়ক সাক্রাই ত্রিমু।
''আমি সেটা জানি। সে বালি অবশ্য বড় বড় নদীগুলোর তীরে থাকার কথা। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে ধরণের কোনো নদীই তো চোখে পড়ল না!'' আবার পিন্‌পিন্ করল লোশাও নামের ভূ-তাত্ত্বিক মেয়েটি।

অধিনায়ক এবার সরাসরি লোশাওর মুখের পানে চেয়ে শুধালেন, ''হেলিজ্যাপাটা থেকে আমাদের নিয়ে আসা রসদের পরিমাণ কতটুকু?'' লোশাও উত্তর করল, ''খুব-ই সামান্য। হাইপার ডাইভ্ মেকানিজ্‌মে সমস্যা দেখা দেওয়ায় ধারণাকৃত সময়ের তিনগুণ বেশীসময় লেগেছে আমাদের। খ্যাঁচ্‌কলটা বেধেছে সেখানেই!''

সাক্রাই প্রস্তাব দিলেন, ''আচ্ছা, মাটিতে কিছু পরিমাণ বালি তো অবশ্যই র'য়েছে। এক কাজ করলে হয় না? এখানকার মাটি পরিশোধন ক'রে খেয়ে দেখলে কেমন হয়?'' লোশাও জানাল, ''সেটি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আমার যতদূর জানা, এখানকার মাটিতে সিলিকার তূলনায় কার্বনের পরিমাণ এত বেশী যে, আমাদের সর্বাধুনিক ছাঁকুনিতেও মাত্র ষাট ভাগ পরিশোধন সম্ভব। তাই এই ভেজাল বালি খাওয়া মাত্রই আমাদেরকে পটল তুলতে হ'তে পারে!''

সাক্রাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোশাওকে আশ্বাস দিলেন, ''দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আশা করি, শিগ্রী আমরা কোনো বালিয়াড়ি অঞ্চল খুঁজে পাব।''
লোশাও বায়না ধরল, ''তবু কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের বেশীদিন থাকা চলবে না। কারণ আর্দ্রতামাপক যন্ত্র বল্‌ছে যে, এখানকার আবহাওয়া ভীষণ স্যাঁত্‌সেঁতে। আর আপনি তো জানেন যে, আমাদের স্পেস্ স্যুটের অবস্থাও তেমন সুবিধার নয়।''
অধিনায়ক সাক্রাই ত্রিমু আবার ভরসা দিলেন, ''ঠিক আছে লোশাও, আমরা এখানকার কাজ দ্রুত শেষ ক'রে পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত শুষ্ক এলাকাগুলোতে চ'লে যাব।''
''আমাদের জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গা হ'ল মরুভূমি।''-লোশাও মারু আবারও প্যান্‌প্যান্ করল।
''সেখানেও যাব আমরা!''-তাল দিলেন ক্যাপ্টেন সাক্রাই ত্রিমু।

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া মহাকাশযান 'ইকারা' (অর্থাৎ 'উদ্ধার'):৭-এর ভেতর উপরোক্ত কথাবার্তা চল্‌ছিল 'সেক্লেম্যুরান্' নামের দুই মহাজাগতিক প্রাণীর মধ্যে। তারা এসেছিল 'হেলিজ্যাপাটা' নামের গ্রহ থেকে। হেলিজ্যাপাটা হ'ল সৌরজগৎ থেকে নয়শত পাঁচ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত 'ইউকানাস্' নামের নক্ষত্রের পঞ্চম গ্রহ, যার দু'টো উপগ্রহ বা 'চাঁদ' হ'ল: ফুবিয়ানা ও ভেল্‌সিনা।

দোয়েল পাখীর মত 'টুই টুই' ক'রে সেক্লেম্যুরান্‌রা কথা বলত। তাদের কোনো জিভ না থাকলেও অত্যন্ত উন্নত ধরণের স্বরযন্ত্রের কারণে তারা খুব-ই স্পষ্ট ক'রে কথা বলতে পারত। আর নিখুঁত সুরেলা কণ্ঠে তারা যে গান গাইত, তা শুধু মানুষকে নয়, পৃথিবীর অন্য যে-কোনো প্রাণীকেও এক মিনিটের মধ্যেই ঘুম পাড়িয়ে দিতে সক্ষম!

একটা দৈত্যাকার মৌমাছির ধড়ের সাথে কোনো হনুমানের মাথা জুড়ে দিলে যেমনটি দেখাবে, হেলিজ্যাপাটাবাসী সেক্লেম্যুরান্‌দের চেহারা ছিল অনেকটা সে রকম। তা ছাড়া প্রাণীগুলোর তিনজোড়া পায়ের সবগুলোতেই সাতটি ক'রে আংগুল। এর মধ্যে সবচেয়ে পেছনের পা-জোড়া বেশ লম্বা, এবং এরা তার ওপর ভর ক'রেই দাঁড়াত।

সামনের দু'জোড়া পা-কে সেক্লেম্যুরান্‌রা হাতের মত ব্যবহার ক'রত। আর তাদের নীল রং-এর ডানা ও সবুজ রং-এর মাথা ছাড়া, গোলাপী বর্ণের বাকী সারা শরীর ঘিরে জড়িয়ে ছিল হাল্‌কা বেগুনী রং-এর সূক্ষ্ম জালিকা। পটাশিয়াম সিলিকেটের এই জালিকা ছিল প্রাকৃতিক, যা তারা বংশানুক্রমিকভাবে মাতৃগর্ভ থেকেই লাভ করত। তাই কৃত্রিম তন্তুর তৈরী বাড়তি কোনো পোষাকের দরকার হ'ত না তাদের। এছাড়া তারা সবাই ডানায় ভর ক'রে উড়তেও সক্ষম ছিল।

সেক্লেম্যুরান্‌দের দেহ ছিল সিলিকাভিত্তিক। সরাসরি বালি ছাড়াও পাথর ও নুড়িচূর্ণ খেত তারা। যদিও তারা পানি পান করত, তবে জ'লো আবহাওয়া তাদের একেবারেই সইত না। তাই বাংলাদেশের মাটিতে অল্পদিন থাকার পরপর-ই পৃথিবীর অন্যান্য শুষ্ক অঞ্চলের উদ্দেশ্যে তারা পাড়ি জমায়।

যাই হোক, এগুলো অনেকদিন আগের কথা। সেক্লেম্যুরান্‌রা ১৯৯৮ সালের মে, জুন ও জুলাই-এই তিন মাসের পুরোটা সময় পৃথিবীতে কাটিয়ে আবার ফিরে গিয়েছিল তাদের নিজ গ্রহে। অভিযানশেষে দলনেতা ক্যাপ্টেন সাক্রাই ত্রিমু যে বিবরণীটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তার অংশবিশেষ ছিল অনেকটা এ রকমঃ

''আমরা অর্থাৎ হেলিজ্যাপাটা গ্রহের সবচেয়ে বুদ্ধিমান স্থলচর প্রাণী সেক্লেম্যুরান্‌রা অনেকদিন ধ'রেই চেষ্টা চালাচ্ছিলাম, পৃথিবীতে একটা সফল অভিযান চালাতে। উদ্দেশ্য ছিলঃ সেখানকার সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা গ্রহণ। সেই সাথে সৌর-মন্ডলীয় এলাকায় বেশ ক'টি কৃত্রিম ক্ষুদে গ্রহ স্থাপনও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

''কিন্তু সৌর জগৎ আমাদের এলাকা থেকে এতই বেশী দূরে যে, 'হাইপার ডাইভ্'-এর সর্বোচ্চ প্রযুক্তির উদ্ভব না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে এ ধরণের কোনো অভিযান চালানো সম্ভবপর হয়নি। যাই হোক, উক্ত প্রযুক্তি আমাদের হাতে আসার পর তার-ই বদৌলতে শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই অভিযান পুরোপুরিভাবে সফল হ'য়েছে।

''পৃথিবীতে আমাদের অভিযানকালে সেখানকার বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে চব্বিশজন মানবশিশুকে উদ্ধার করা হয়। এরা সবাই দেড় থেকে পৌণে দুই কুবিন, অর্থাৎ পৃথিবীর সময় হিসেবে আট থেকে দশ বছর বয়সসীমার মধ্যে। তাদের কেউ জলে ডুবে মারা যাচ্ছিল, কেউ দূর্ঘটনায় পরিবারের সবাইকে হারিয়েছিলে, কাউকে আবার নিষ্ঠুরভাবে দুর্বৃত্তরা হত্যা করতে উদ্যত হ'য়েছিল। অনেককে উদ্ধার ক'রে তাদের আত্মীয়-পরিজনের কাছে গোপনে ফিরিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। আমাদের নিজস্ব বিশেষ কৌশলে খোঁজ-খবর নিয়ে যখন আমরা নিশ্চিত হ'য়েছিলাম যে, উদ্ধারকৃতদের মধ্যে চব্বিশজনের তেমন কোনো আত্মীয় বা নিকটজন নেই, শুধুমাত্র তখন-ই তাদেরকে মহাকাশযানে ক'রে হেলিজ্যাপাটাতে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

''সেক্লেম্যুরান্‌দের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বিজ্ঞান পরিষদ সম্প্রতি পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রেছে যে, এই চব্বিশজন মানবসন্তানকে হেলিজ্যাপাটার সাগরতীরে তাদের বসবাসের উপযোগী ক'রে বিশেষভাবে নির্মিত ফ্ল্যাটে রাখা হবে। অভিযাত্রীরা পৃথিবী থেকে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত প্রচূর বইপত্র, ভিডিও এবং অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম সাথে ক'রে নিয়ে এসেছে, যা ব্যবহার ক'রে মানবসন্তানদের সময় সুন্দরভাবে কেটে যাওয়ার কথা। সেই সাথে মানুষের ভক্ষণের উপযোগী পর্যাপ্ত কার্বনভিত্তিক খাবারও আনা হ'য়েছে, যা খেয়ে তারা বেশ কিছুদিন জীবনধারণ করতে সক্ষম হবে। সেই সাথে তাদের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ঠ পরিমাণ পোষাকও নিয়ে আসা হ'য়েছে।

''যেহেতু আমাদের গ্রহ হেলিজ্যাপাটার স্থলভাগ উদ্ভিদহীন ও কার্বনশূন্য, সেইহেতু ইতিমধ্যেই কার্বনভিত্তিক দেহের অধিকারী জলচর বুদ্ধিমান প্রাণী কাঁকড়াসদৃশ গেটাস্পোরদের সাথে সেক্লেম্যুরান্‌দের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হ'য়েছে ব'লে আমরা জ্ঞাত হ'য়েছি। এই চুক্তি মোতাবেক সেক্লেম্যুরান্‌দের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদী মূল্যবান প্রযুক্তিগত সহায়তার বিনিময়ে গেটাস্পোররা পরবর্তীকালে মানবসন্তানদের জন্য রসদ হিসাবে সাগরতলের শৈবাল ও ক্ষুদ্রাকার প্রাণী সরবরাহ ক'রে যাবে।

''একটি রহস্য ভেদ করা যায়নি। আর তা হ'লঃ পৃথিবীর মাটিতে এত বালি থাকা সত্ত্বেও সেখানে কোনো সিলিকাভিত্তিক প্রাণের বিকাশ ঘটেনি কেন। তবে হেলিজ্যাপাটার সুবিজ্ঞ প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ এ ব্যাপারে তাঁদের চূড়ান্ত মতামত প্রদান করবেন ব'লে আশা করছি।

''আমাদের আরেকটি প্রশ্ন ছিলঃ মানুষ এত বেশী সরব কেন? তাদের বাক্যালাপ, উপদেশ বিতরণ, কিংবা সংগীত পরিবেশন- সবকিছুই উচ্চ ধ্বনিময়। কিন্তু কেন? এ ব্যাপারে অনেক চিন্তা-ভাবনা ক'রে যে ব্যাখ্যাটি আমরা দাঁড় ক'রিয়েছি, তা মানবসন্তানদের জানানো কখনোই সমীচীন হবে না। আমরা মনে করি, আসলে মানুষের মধ্যে একের ব্যাপারে অপরের আগ্রহ খুব-ই কম।

''উদ্ধারকৃত মানবসন্তানদের উপর সুকৌশলে বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে যে সকল ফলাফল পাওয়া গেছে, তা হ'ল এই যে, আসলে মানুষেরা একের কথা অন্যে শতকরা মাত্র ষোল থেকে আঠার ভাগ মনোযোগ দিয়ে শোনে, যেখানে সেক্লেম্যুরান্‌দের ক্ষেত্রে তা হ'ল শতকরা পঁচাশি থেকে নব্বই ভাগ। মানুষের পরস্পরের প্রতি এই অনীহা ও অমনযোগের ব্যাপারে সম্ভবতঃ তারা নিজেরাও অবচেতনভাবে কিছুটা ওয়াকিবহাল। আর তাই অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের বাড়তি প্রয়াস হিসাবেই তাদের এই উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন ও সংগীত

পরিবেশন, যা কালের বিবর্তনে মানুষের মজ্জাগত হ'য়ে গেছে! শুধু তাই নয়। আমাদের আশংকা, সম্ভবতঃ মানুষের এই প্রবণতা ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী!''

যা হোক, সাগরপাড়ের ভিলাগুলোতে মানবসন্তানদের দিন খুব চমৎকার কাটছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল বাংলাদেশ থেকে উদ্ধারকৃত কবীর আহমেদ। তার সাথে সেখানকার একজন সেক্লেম্যুরান্ পরিচারিকা আমুকা জানুলের বেশ ভাব হ'য়ে গেল।

প্রথম পরিচয়ের দিন আমুকাকে কবীর জিজ্ঞেস ক'রে ব'সল, ''আচ্ছা, একজন ভিন্‌গ্রহবাসী হ'য়েও এত সুন্দর বাংলা তুমি কোথায় শিখলে গো?'' আমুকার সহজ উত্তর, ''কোথায় আবার? বাংলা ভাষা লিখতে, পড়তে ও বল্‌তে পারার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য হেলিজ্যাপাটার কেন্দ্রীয় মেগা-কম্পিউটার 'মারুকাতা' থেকে সরাসরি আমার মস্তিষ্কের স্মৃতি কুঠুরীতে ডাউনলোড্ করা হ'য়েছে। আমি কিন্তু ইংরেজী ও জার্মান ভাষাও জানি। শুধু আমি নই, আমাদের মধ্যে আরো অনেকেই জানে।''

কবীর আবার মুখ খুল্‌ল, ''তাহ'লে তো বলা যায় যে, তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক মেধাবী!'' নীল ডানায় ভর ক'রে মাটি থেকে সামান্য উপরে ভাসতে ভাসতে আমুকা বল্‌ল, ''আগে আমাদেরও সেরকমই ধারণা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি তোমাদের মস্তিষ্ককে বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, মানুষের মেধা, বুদ্ধি এবং মস্তিষ্কের তথ্যধারণ ক্ষমতা সেক্লেম্যুরান্‌দের চাইতে অনেক বেশী।''

কবীর বল্‌ল, ''তাহ'লে যে কোনো জিনিস শিখতে আমাদের এত বেশী সময় লাগে কেন?'' আমুকা ব্যাখ্যা করল, ''কারণ তোমাদের শেখার পদ্ধতি অত্যন্ত প্রাচীন ধরণের। দেখা, শোনা ও নিজে কোনো কাজ করা ছাড়া মানুষ নতুন কিছু শিখতে পারে না। তাই তোমাদের শিখতে এত বেশী সময় লাগে। আমাদের অবস্থাও একসময় তোমাদের মতই বেহাল ছিল। কিন্তু এখন আমরা সরাসরি 'ডাউনলোড্' পদ্ধতিতে দ্রুত নতুন কিছু শিখে ফেল্‌তে পারি।''

আরেকদিন কবীর আমুকাকে ব'লেই ফেল্‌ল, ''আমুকা, আমার একটা কথায় তুমি কিছু মনে কোরো না। তোমরা সেক্লেম্যুরান্‌রা তো খুব-ই জ্ঞানী আর ভাল, আবার চমৎকার গানও গাও। কিন্তু তোমরা দেখতে এত কুৎসিত কেন?''

আমুকা বাতাসে চক্কর দিতে দিতে তার জলতরংগের মত চমৎকার কণ্ঠে মৃদু স্বরে বল্‌ল, ''তুমিও কিছু মনে কোরো না কবীর, আসলে তোমরাও আমাদের চোখে তেমন সুন্দর নও। তাতে কি আসে যায়? সত্যি কথাটি হ'ল, আমাদের চোখে কিন্তু আমরা সুন্দর, তোমরা যেমন তোমাদের চোখে!'' তারপর কি যেন একটু ভেবে নিয়ে যোগ করল, ''এ নিয়ে চিন্তা কোরো না, শিগ্রী এই সমস্যার সমাধান আসছে। তবে একটু সময় লাগবে।''

পৃথিবীর সময় হিসেবে আরো সাড়ে সাত বছর পর ২০০৬ সালের ৭ই জানুয়ারী হেলিজ্যাপাটা গ্রহে মোট চব্বিশজন মানবসন্তান শিক্ষার্থী ও সেই গ্রহের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী 'সেক্লেম্যুরান্' সম্প্রদায়ভুক্ত চারজন শিক্ষক নিয়ে গ'ড়ে উঠল একটি অত্যন্ত অভিনব ধরণের বিদ্যালয়। ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীদের সবাই পৃথিবীর বেশ ক'টি ভাষা শিখে ফেলেছিল। তবে তাদের মধ্যে বাংলাই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। বেশীরভাগ সময় সকলে বাংলাতেই আলাপ করত।

‘ক্লারা হার্ডিং’ নামের একজন মার্কিন ছাত্রীর ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির অভ্যেস ছিল। সে ইদানীং প্রায় অন্যদের বলত, ‘‘দেখ, আমি ইতিমধ্যে পৃথিবীর তিন-চারটে ভাষা শিখে ফেলেছি। আমি মনে করি, বাংলার মত এত ছন্দোময় ভাষা আর হয় না! আসলে কবিতা বা ছড়া লিখার জন্য বাংলা ভাষা খুব-ই উপযোগী!!’’

একদিন গুদাম থেকে সদ্য বের করা একটা নতুন বল নিয়ে ছেলেরা তাদের ফ্ল্যাটের সামনের খোলা জায়গাটিতে খেলছিল। ক্লারা একটা বাংলা ছড়া লিখে সবাইকে আবৃত্তি ক’রে শোনাতে লাগলঃ
‘‘দৌড়াদৌড়ি চেঁচামেচি- খেলছে ছেলের দল,
আগে আগে ছুটছে তাদের নতুন কালো বল!!’’

ছাত্রীদের মধ্যে ভারতীয় কিশোরী আশা কানিত্কার-ই সবচেয়ে সুন্দরী ছিল এবং এই মেয়েটির বন্ধুত্ব ও সান্নিধ্য লাভের আশায় ইংরেজ ছাত্র পল ডানকান ও কেনীয় ছাত্র সিসায় আবুকির মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা ছিল। অবশ্য আশার পাল্লা সামান্য ঝুঁকে ছিল পলের দিকে। কারণ পল্ ছিল শ্বেতাংগ। অপর দিকে সিসায় কৃষ্ণাংগ হ’লেও ওর চেহারা, কণ্ঠঃস্বর ও বাচনভংগী ছিল যে কোনো মেয়ের হৃদয় ভেদ করার মত। তাই আশা কানিত্কার তাকেও আশা-নিরাশার দোদুল দোলার মধ্যে রেখেছিল। সিসায়কে দেখলে আশার কেন যেন শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে প’ড়ে যেত।

বিদ্যালয় উদ্বোধনের দিন প্রধান শিক্ষকের সহযোগী হিসাবে ছিলেন আরো তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা, যাঁরা একে একে নিজেদের পরিচয় দিলেন। তবে মুস্কিল হ’ল, তাঁরা কেবল কুদর্শনই ছিলেন না, সবাই দেখতে প্রায় একই রকমের ছিলেন। এখনই যদি শিক্ষকবৃন্দ বাইরে থেকে একটু ঘুরে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞেস ক’রে বসেন, ‘‘বলতো, আমরা কে কোন্ জন?’’, তা হ’লে তাঁদেরকে সনাক্ত করা কারো বাপেরও সাধ্য ছিল না!

প্রধান শিক্ষক মিঃ মোদি র‍্যালাওক্ পরিষ্কার বাংলাতে তাঁর শিক্ষার্থীদের জানালেন যে, দু’টি অসাধারণ রকমের হেল্মেট্ আবিষ্কারের মাধ্যমে তাঁরা একটি অতি পুরাতন সমস্যার স্থায়ী সমাধান ক’রে ফেলেছেন।
হেল্মেটগুলো ট্রলিতে ক’রে নিয়ে এসেছিলেন শিক্ষকবৃন্দ। তার মধ্যে চব্বিশটি ছিল এক নম্বর চিহ্নিত ও চারটি ছিল দুই নম্বর চিহ্নিত হেল্মেট্। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাইকে সেগুলো পরার সুযোগ দেওয়া হবে ব’লে কিচিরমিচির ক’রে জানালেন গণিত শিক্ষিকা মিসেস্ ওতা জারিস্যেমু। হেল্মেট্গুলো খুব-ই স্বচ্ছ এক ধরণের পদার্থ দিয়ে তৈরী। যে ওগুলো পরবে, তার চেহারা পরিষ্কার দেখা যাওয়ার কথা।

সবার আগে হেল্মেট্ পরতে দেওয়া হ’ল কবীরকে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সে-ই ছিল সর্বকনিষ্ঠ। হেল্মেট্টি তার মাথায় একটু ঢিলেই হ’ল। সেটি পরার পর চারিদিকে একবার তাকাল সে। কবীর অনুভব করল যে, তার মাথাটা সামান্য ঝিম্ঝিম্ করছে। কিন্তু অবাক হওয়ার মত তেমন কিছুই চোখে পড়ল না তার। বিজ্ঞান শিক্ষিকা মিস্ তেন্মিচা সাওলাবুনার কণ্ঠঃস্বর শুন্তে পেল সে, ‘‘কবীর, আমি তেন্মিচা বল্ছি। আমার দিকে ভাল ক’রে তাকাও। এই যে, আমি এখানে এই উঁচু ডেস্ক্টার ওপর দাঁড়িয়ে আছি।’’

তেন্‌মিচার দিকে তাকাল কবীর। গভীর মনোযোগের সাথে তাঁকে নিরীক্ষণ করতে করতে এক অচেনা ধরণের চমকপ্রদ অনুভূতি কবীরের মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ল। অপূর্ব সুন্দর চেহারার এক মেয়ে-সেক্লেম্যুরান্‌ হাসিমুখে ডেস্কের ওপর দাঁড়িয়েছিল। চমৎকার ভংগীতে ডান পাখ্‌না নেড়ে নেড়ে বল্‌ছিল প্রাণীটি, ''আমিই তোমাদের বিজ্ঞান শিক্ষিকা তেন্‌মিচা! আমার সজাতি সেক্লেম্যুরান্‌দের চোখে আমাকে যে রকম দেখায়, এই মুহূর্তে তুমিও আমাকে সে রকমটিই দেখছ।''

কবীর খুব অবাক হ'য়ে লক্ষ্য করল যে, মিস্‌ তেন্‌মিচা সাওলাবুনার আদল কিন্তু আগের মতই র'য়ে গেছে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল, দেখতে মোটেও মানুষের মত না হ'লেও তাঁকে একজন সুন্দরী নারীর মতই অপরূপ দেখাচ্ছিল। ছোটবেলায় রূপকথার বইতে পরীর ছবি দেখে কবীরের যেরকম ভাল লেগেছিল, তেন্‌মিচাকে হেল্‌মেটের ভেতর দিয়ে দেখেও তার মনের অনুভূতি অনেকটা সে-রকমই হ'ল।

তারপর কবীর অন্যান্য শিক্ষকদের দিকে মনযোগ দিল। দেখলঃ একজন বয়স্ক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ সেক্লেম্যুরান্‌ হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে র'য়েছেন। নিশ্চয় তিনি প্রধান শিক্ষক মিঃ মোদি র‍্যালাওক্‌-ই হবেন। তাঁর ডানপাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বেশ শক্ত সমর্থ পেটা শরীরের অধিকারী যুবক এবং বামপাশে একটা ছোট্ট আসনের উপর ব'সে র'য়েছেন একজন মাঝবয়সী মহিলা সেক্লেম্যুরান্‌। কবীর অনুমান করল, তাঁরা যথাক্রমে মহাকাশ শিক্ষক মিঃ বোগি চাক্কুর ও গণিত শিক্ষিকা মিসেস্‌ ওতা জারিস্যেমু। আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল, মানুষের চেহারা কেমন, তা কবীর সেই মুহূর্তে ঠিক স্মরণ করতে পারল না।

হঠাৎ কি ভেবে কবীর তার সহপাঠীদের দিকে ফিরে চাইল। মানুষের চেহারা আবার মনে প'ড়ে গেল তার। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল, সেই মুহূর্তে তাদের সবাইকে কবীরের চোখে কুৎসিত দেখাচ্ছিল। এই প্রথম সে অনুভব করল যে, মানুষ বেশ কদাকার প্রাণী, তারা সবাই দেখতেও প্রায় এক-ই রকমের এবং কে যে ছেলে, আর কে যে মেয়ে, সেটাও বুঝে ওঠা বড়ই কঠিন! আবার তার কানে বিজ্ঞান শিক্ষিকা তেন্‌মিচার মিষ্টি কণ্ঠঃস্বর ভেসে এল, ''কবীর, আমাদের চোখে তোমাদেরকে যেমনটি দেখায়, তুমি এখন তোমাদের বন্ধুদেরকে তেমনটিই দেখছ।''

এরপর সব ছাত্র-ছাত্রীকেই একটি ক'রে এক নম্বর হেল্‌মেট্‌ দেওয়া হ'ল এবং তাদেরকে বিশেষভাবে ব'লে দেওয়া হ'ল যেন তারা শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষেই সেগুলো ব্যবহার করে। তাছাড়া হেল্‌মেট্‌ পরা অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা যেন একে অপরের দিকে না তাকায়, সে অনুরোধও করা হ'ল তাদেরকে। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

জিনিসগুলো বিতরণের পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাড়া প'ড়ে গেল। অনেকক্ষণ ধ'রে তারা হৈচৈ ও মজা করল। ভারতীয় কিশোরী আশা তার পাশে বসা শ্বেতাংগ পল্‌ এবং কৃষ্ণাংগ সিসায়কে উদ্দেশ্য ক'রে তো ব'লেই ফেল্‌ল, ''দ্যাখো, আমার একটা কথায় তোমরা কেউ কিছু মনে ক'রো না কিন্তু। এই হেল্‌মেট্‌টা পরার আগ পর্যন্ত আমি পল্‌কে সিসায়ের চাইতে দেখতে বেশী সুন্দর ব'লে মনে করতাম। কিন্তু এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, তোমরা আসলে কেউই দেখতে সুন্দর নও। তোমাদের একজন যদি হও একটা সাদা ভূত, তবে অন্যজন হ'লে একটা কাল

ভূত, এর বেশী কিছু না! মহাকাশ শিক্ষক মিঃ বোগি চাক্কুর তোমাদের চাইতে অনেক-অনেক বেশী সুদর্শন!!!''

পল্ ও সিসায়- দু'জনেই আশার ওপর ভীষন চ'টে গিয়ে বল্ল, ''আর তুমি তো দেখতে একটা বাদামী শিম্পাঞ্জীর মত! এই সারা ঘরে সুন্দরী যদি কেউ থেকেই থাকে, তবে সে হ'ল একমাত্র তেন্মিচা!!''

এরপর শিক্ষার্থীরা দুই নম্বর হেল্মেট্টি পরতে চাইল।
''নিশ্চয় ওটা আরো বেশী মজার হেল্মেট, তাই না তেন্মিচা? এবার তা হ'লে আমাকে দিয়েই শুরু কর।'' বল্ল মার্কিন শ্বেতাংগ কিশোরী ক্লারা হার্ডিং।
''না ক্লারা, এটা তোমাদের জন্য নয়। এটা প'রব কেবল আমরা, অর্থাৎ সেক্লেম্যুরান্রা, তোমাদেরকে দেখার জন্য। আর তা ছাড়া তোমাদের গোলাকার মাথায় এই দুই নম্বর হেল্মেট্টা লাগবেও না। এটা আমাদের লম্বাটে মাথার উপযোগী ক'রে বানানো।''-তেন্মিচা ব্যাখ্যা করলেন।

এরপর তিনি তাঁর জন্য নির্ধারিত দু'নম্বর হেল্মেট্টি প'রে ফেল্লেন। শিক্ষার্থীদের বেশ ক'জন সমঃস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, ''তেন্মিচা, ওটা প'রে আমাদেরকে কেমন দেখছেন?''

ইতিমধ্যে বাকী তিনজন শিক্ষকও এক-ই ধরণের দু'নম্বর হেল্মেট্গুলো প'রে ফেলেছিলেন। চারজন সেক্লেম্যুরান্ শিক্ষক-ই প্রায় একসাথে ব'লে উঠলেন, ''বাহ্ বাহ্, কী অপূর্ব তোমাদের সকলের চেহারা! আমরা তো আগে কখনো কল্পনাই করিনি যে, তোমরা অর্থাৎ মানুষরা সবাই দেখতে এতটা সুন্দর!!''

সকল শিক্ষার্থী আবার সমঃস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, ''আমাদের মধ্যে কে কে বেশী সুন্দর বলতে হবে আপনাদেরকে!'' ভারতীয় ছাত্রী আশার কণ্ঠঃস্বর-ই ছিল সবচাইতে তীক্ষ্ণ। শিক্ষকবৃন্দের সবাইকেই একটু বিভ্রান্ত দেখাল। সামান্য বিরতি দিয়েই তাঁরা রায় দিলেন, ''না, এটা বলা যাবে না। আর তা ছাড়া তোমরা সকলেই দেখতে খুব সুন্দর, কেউ কারো চেয়ে কমও নও, বেশীও নও।''

সারা শ্রেণীকক্ষ জুড়ে হাসির রোল উঠল।

(দ্বিতীয় পর্বে শেষ হবে)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ১০/০২/২০০৬